International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ঝাড়খণ্ডের লুপ্তপ্রায় ফকিরি গীত: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক জীবন্ত ঐতিহ্য

অমৃত মণ্ডল[1], ড. প্রিয়াঞ্জনা ব্যানার্জী[2]

[1]ডক্টরাল রিসার্চ স্কলার, বাংলা বিভাগ, সোনা দেবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঘাটশিলা, ঝাড়খণ্ড
[2]সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সোনা দেবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঘাটশিলা, ঝাড়খণ্ড

সারসংক্ষেপ:
ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি বহুমাত্রিক এবং বহুস্তরবিশিষ্ট, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায়ের সহাবস্থান একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিফলিত হয়। এই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম মূল্যবান সম্পদ হলো ফকিরি গীত-যা সুফি সাধনা ও ভক্তি ভাবধারার সৃজনশীল সংমিশ্রণে বিকশিত এক আধ্যাত্মিক লোকসংগীতধারা। মানবপ্রেম, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ধর্মীয় সহনশীলতার মর্মবাণী ধারণ করে ফকিরি গীত দীর্ঘকাল ধরে গ্রামীণ জনজীবনে সম্প্রীতির আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। এর সুরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, আর তার বাণীতে ধ্বনিত হয়েছে বিভেদের পরিবর্তে মিলনের আহ্বান। কিন্তু পরিবর্তনশীল সময়ের অভিঘাতে এই ঐতিহ্যবাহী গীতধারা আজ অস্তিত্বসংকটের মুখোমুখি। আধুনিকতার প্রবল স্রোত, নগরায়নের বিস্তার, প্রযুক্তিনির্ভর বিনোদনের প্রসার এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ফলে ফকিরি গীতের চর্চা ক্রমশ সীমিত হয়ে পড়ছে। একসময়ের প্রাণবন্ত লোকঐতিহ্য আজ ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় নিমজ্জিত। একই সঙ্গে এই গীতধারার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে বার্তা প্রচারিত হয়, তা নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ফকিরি গীত শুধু একটি সঙ্গীতধারা নয়, বরং এটি সামাজিক ঐক্য ও সহনশীলতার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তাই এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও পুনর্জাগরিত করা কেবল সাংস্কৃতিক দায়িত্ব নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধ ও সম্প্রীতির চেতনাকে ভবিষ্য□ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অঙ্গীকার।

মূল শব্দ: ফকিরি গীত, ঝাড়খণ্ড, লোকসংস্কৃতি, সুফি ভাবধারা, মানবতাবাদ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, লোকঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ।

ভূমিকা

মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।
এক সে আকাশ মায়ের কোলে যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান।।
—কাজী নজরুল ইসলাম

লোকসংস্কৃতি কোনো অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক সম্পর্কের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। হিন্দু-মুসলমানের ভেদ হল মানুষের তৈরি। কেউ বলে জল,

কেউ বলে পানি; কিন্তু বস্তু একটাই। একই আকাশ, একই বাতাস, সব মানুষের খিদের যন্ত্রনাও এক। তবু কেন মানুষ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তোলে? দাঙ্গাবাজ মানুষদের কবি 'দানো' বলছেন। এই দানোরাই একই মানুষকে দুটো ভাগ করে দাঙ্গা বাধায়, কিছু মানুষ এই দুই জাতির মধ্যে ভেদের প্রাচীর তৈরি করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভেদ বলে কিছু নেই। কারণ একই দেশের ফল, জল, অন্ন আমাদের আহার। ব্যথা বেদনায় একই অনুভূতি। তাই মানুষে মানুষে ধর্মের ভেদে ভাগাভাগি কখনই মেনে নেওয়া যায় না। [১] মৌখিক পরম্পরার মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত এই লোকসংস্কৃতি মানুষের পরিচয় নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ সমাজে লোকসংগীত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবন, শ্রম, আনন্দ-বেদনা এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে সহজ ও প্রাণবন্ত ভাষায় প্রকাশ করে। এই প্রেক্ষাপটে ফকিরি গীত একটি অনন্য লোকসঙ্গীতধারা, যা মানবতাবাদ, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বহন করে। [২]

ঝাড়খণ্ড ভারতের একটি বহুজাতিক, বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক রাজ্য, যেখানে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, হো, মাহাতোসহ বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বা একসাথে অবস্থান করে আসছে। এই বহুমাত্রিক সামাজিক কাঠামোর ফলে এখানে বিভিন্ন ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক চর্চার এক সমৃদ্ধ সংমিশ্রণ দেখা যায়। নাগপুরী, সাঁওতালি, মুণ্ডারি, বাংলা ও হিন্দি ভাষার পাশাপাশি বিভিন্ন লোকগীতি, নৃত্য ও উৎসব এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই গড়ে উঠেছে এমন কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান, যা ভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে- ফকিরি গীত তাঁর মধ্যে অন্যতম। [৩]

ফকির শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ থেকে ,যার অর্থ হল 'মুসলমান সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক'।' অর্থাৎ যে সকল মুসলমান ব্যক্তি সন্ন্যাসী বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, তুকতাক্ সহ বাচ্চাদের সুস্থতা বিষয়ক নানাবিধ জড়িবুটি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে তারাই হল মূলতঃ 'ফকির'। ফকিরি গীত মূলত সুফি ও ভক্তি ভাবধারার সম্মিলিত প্রভাব থেকে উদ্ভূত এক ধরনের আধ্যাত্মিক লোকসংগীত। 'ফকির' শব্দটি এমন এক সাধককে নির্দেশ করে, যিনি জাগতিক আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মবোধ লাভের সাধনা করেন। এই সাধকদের জীবনদর্শন, মানবতাবাদী চিন্তা ও ধর্মীয় সহনশীলতা ফকিরি গীতের মূল ভিত্তি।[৪] তাই লোক কবি পাগলা কানাই মানুষে মানুষে বিভিন্নতা বা জাতবিভাজন একেবারেই অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বলেন "কেউ বলে দুর্গা হরি। কেউ বলে বিসমিল্লা আখেরী / তবু পানি খেতে যায় এক দরিয়ায়।'এই গানে আল্লাহ, ঈশ্বর, হরি বা রাম- সকলকেই এক সর্বজনীন সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা ধর্মীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দেয়।[৫] সাধারণত গ্রামীণ পরিবেশে মেলা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আখড়া বা সন্ধ্যাকালীন আসরে এই গীত পরিবেশিত হয় এবং এতে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে অংশগ্রহণ করে। ফলে এটি শুধু একটি সঙ্গীতধারা নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিশ্বায়ন, আধুনিকতা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে লোকসংস্কৃতির অনেক উপাদান বিলুপ্তির মুখে পড়েছে। ফকিরি গীতও এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ধারার বাইরে নয়। আধুনিক বিনোদন মাধ্যমের প্রসার, তরুণ প্রজন্মের আগ্রহের অভাব, এবং গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে এই গীতধারার চর্চা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে । ফলে এটি একটি লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যে পরিণত হচ্ছে, যা সংরক্ষণ ও পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।[৬]

এই প্রেক্ষাপটে ফকিরি গীত নিয়ে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে এটি ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে নথিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করবে, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মতো একটি মৌলিক সামাজিক মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করবে। বর্তমান সমাজে যখন ধর্মীয় বিভাজন ও অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন ফকিরি গীতের মতো ঐতিহ্য আমাদের সামনে এক মানবিক ও সহনশীল সমাজ গঠনের বিকল্প পথ দেখায়। সুতরাং, এই গবেষণা শুধুমাত্র একটি লোকসঙ্গীতের অধ্যয়ন নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়াস, যা ঐক্য, সম্প্রীতি এবং মানবতার মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত।[৭]

সাহিত্য পর্যালোচনা

লোকসংস্কৃতি, বিশেষত লোকসংগীত, সুফি সঙ্গীত এবং ভক্তি আন্দোলন নিয়ে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বহু গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। এই গবেষণাগুলিতে মূলত লোকজ ঐতিহ্যের মানবতাবাদী দিক, আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে ঝাড়খণ্ডের ফকিরি গীতের মতো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ধারার উপর গবেষণা তুলনামূলকভাবে সীমিত। এই অংশে পূর্ববর্তী গবেষণার আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করা হবে এবং গবেষণার ফাঁক চিহ্নিত করা হবে।

লোকসংগীত বিষয়ক গবেষণায় A.K. Ramanujan ভারতীয় মৌখিক ঐতিহ্যের বহুমাত্রিকতা ও তার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, লোকসংগীত কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি সমাজের অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ধারক।[৮] একইভাবে Rabindranath Tagore তাঁর রচনায় লোকসংস্কৃতির মানবতাবাদী দিক এবং গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, লোকগান মানুষের আত্মিক বিকাশ ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৯]

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে Bronislaw Malinowski তাঁর কার্যকরীতাবাদী তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, সমাজের প্রতিটি সাংস্কৃতিক উপাদান মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, ফকিরি গীতের মতো লোকসংগীত সামাজিক সংহতি ও মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে।[১০] অপরদিকে Clifford Geertz সংস্কৃতিকে প্রতীকী ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে প্রতিটি সাংস্কৃতিক উপাদান একটি নির্দিষ্ট অর্থ ও প্রতীক বহন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফকিরি গীতকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি ধর্মীয় সম্প্রীতি ও মানবতাবাদের প্রতীক হিসেবে কাজ করে।[১১]

সুফি সঙ্গীত এবং ভক্তি আন্দোলন নিয়ে গবেষণায় দেখা যায় যে, এই দুই ধারাই ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুফি সাধকরা তাঁদের সহজ-সরল ভাষায় রচিত গানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছেন। একইভাবে ভক্তি আন্দোলনের সাধকরা ব্যক্তিগত ঈশ্বরচেতনার উপর জোর দিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি ভেঙে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মকে সহজলভ্য করে তুলেছেন। এই দুই ধারার মিলনেই ফকিরি গীতের মতো একটি সংকর লোকসংগীতের উদ্ভব হয়েছে, যা ধর্মীয় বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে এক সার্বজনীন মানবতাবাদী বার্তা প্রদান করে।[১২]

ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি নিয়ে কিছু গবেষণা হলেও সেগুলি প্রধানত নৃত্য, উ□সব বা সাধারণ লোকগীতির উপর কেন্দ্রীভূত। ফকিরি গীতকে কেন্দ্র করে সুসংহত ও গভীর গবেষণা এখনও খুবই সীমিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফকিরি গীতকে বৃহত্তর সুফি বা লোকসংগীতের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ভূমিকা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গঠনে এর অবদান নিয়ে বিশদ আলোচনা খুব কমই দেখা যায়।

এই প্রেক্ষাপটে গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক (Research Gap) স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। প্রথমত, ঝাড়খণ্ডের ফকিরি গীতের উপর আঞ্চলিক ও ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক গবেষণার অভাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই গীতধারার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কীভাবে গড়ে ওঠে এবং তা সমাজে কী প্রভাব ফেলে-এই বিষয়ে

বিশ্লেষণমূলক গবেষণা প্রায় অনুপস্থিত। তৃতীয়ত, আধুনিকতার প্রভাবে এই গীতধারার বিলুপ্তির কারণ এবং সংরক্ষণের উপায় নিয়ে সমন্বিত গবেষণারও অভাব লক্ষ্য করা যায়।[১৩]

ফকিরি গীতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ঝাড়খণ্ডের ফকিরি গীতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটি কোনো একক সাংস্কৃতিক ধারার ফল নয়; বরং এটি সুফি আন্দোলন, ভক্তি আন্দোলন এবং লোকজ আধ্যাত্মিকতার সম্মিলিত প্রভাবে গড়ে ওঠা এক বহুমাত্রিক ঐতিহ্য। এই গীতধারা মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের সাক্ষ্য বহন করে, যেখানে ধর্মীয় বিভাজনের পরিবর্তে মানবতাবাদ, সহনশীলতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।[১৪] প্রথমত, সুফি আন্দোলনের প্রভাব ফকিরি গীতের গঠন ও বিকাশে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুফিবাদ মূলত ইসলামের একটি আধ্যাত্মিক ধারা, যা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে অন্তর্গত ঈশ্বরচেতনা ও প্রেমকে বেশি গুরুত্ব দেয়। মধ্যযুগে সুফি সাধকরা ভারতীয় উপমহাদেশে এসে তাঁদের সহজ-সরল ভাষায় রচিত গান, কবিতা ও বাণীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেম এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেন। তাঁরা ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরোধিতা করে সকল মানুষকে সমানভাবে গ্রহণ করার আহ্বান জানান।[১৫] ঝাড়খণ্ড অঞ্চলেও এই সুফি সাধকদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে এবং তাঁদের দর্শন স্থানীয় লোকসংস্কৃতির সঙ্গে মিশে ফকিরি গীতের মতো এক বিশেষ গীতধারার জন্ম দেয়। এই গানে আল্লাহর পাশাপাশি ঈশ্বর বা হরির নাম উচ্চারিত হয়, যা ধর্মীয় সমন্বয়ের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। দ্বিতীয়ত, ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব ফকিরি গীতের বিকাশে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভক্তি আন্দোলন ছিল এক সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন, যা ঈশ্বরের প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তি ও প্রেমের উপর জোর দেয় এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জটিলতাকে অস্বীকার করে। এই আন্দোলনের সাধকরা যেমন-কবীর, নামদেব, চৈতন্য প্রভৃতি-মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে এক সার্বজনীন মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের রচিত ভজন ও কীর্তন সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপিত হতো, যা ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে সামাজিক ঐক্যকেও জোরদার করত।[১৬] ফকিরি গীতের মধ্যে এই ভক্তি ধারার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, যেখানে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, আত্মসমর্পণ এবং মানবতার বার্তা একত্রে প্রকাশ পায়। তৃতীয়ত, লোকজ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ফকিরি গীতের একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী ও গ্রামীণ সমাজে দীর্ঘদিন ধরে যে লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রকৃতিনির্ভর জীবনদর্শন প্রচলিত রয়েছে, তা এই গীতধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এখানে ঈশ্বর বা পরম সত্তাকে কেবল ধর্মীয় গ্রন্থ বা মন্দির-মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় না; বরং প্রকৃতি, মানুষ এবং দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেই তার উপস্থিতি অনুভব করা হয়। তাই মধ্যযুগীয় কবি বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা একটি অমর মানবিক বাণী, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"[১৭] এই লোকজ আধ্যাত্মিকতা ফকিরি গীতকে আরও সহজ, প্রাণবন্ত এবং সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। ফলে এই গীতধারা একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ, অন্যদিকে তেমনি এটি সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতির কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ফকিরি গীতের বৈশিষ্ট্য

ঝাড়খণ্ডের ফকিরি গীত তার বহুমাত্রিক গঠন ও উপস্থাপনার জন্য বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। এটি কেবল একটি সঙ্গীতধারা নয়, বরং ভাষা, সুর, আখ্যান, প্রতীক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি সমন্বিত সাংস্কৃতিক রূপ।[১৮] নিচে এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হলো—

ফকিরি গীতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর বহুভাষিকতা। ঝাড়খণ্ডের বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রতিফলন হিসেবে এই গানে সাঁওতালি, নাগপুরী, মুণ্ডারি, বাংলা এবং হিন্দি ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে একই গানের মধ্যে একাধিক ভাষার সংমিশ্রণ ঘটে, যা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সহজ যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। এই ভাষাগত বৈচিত্র্য ফকিরি গীতকে একটি সার্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপ প্রদান করেছে, যেখানে ভাষার বাধা অতিক্রম করে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।[১৯] ফকিরি গীতের সুর সাধারণত সহজ, মধুর এবং আবেগঘন, যা সহজেই শ্রোতাদের মনকে স্পর্শ করে। এর ছন্দ প্রায়শই ধীর থেকে মধ্যগতির হয়, যা ধ্যানমগ্ন ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিছু ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তিমূলক সুর (repetitive melody) ব্যবহার করা হয়, যা গানের মূল বার্তাকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরে এবং শ্রোতাদের সম্মিলিতভাবে গাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই সরলতা ও সুরের আবেগঘন বৈশিষ্ট্য ফকিরি গীতকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।[২০] ফকিরি গীত সাধারণত একক বা দলগতভাবে পরিবেশিত হয়। এটি কেবল গান হিসেবে নয়, বরং কাহিনীমূলক উপস্থাপনার মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়, যেখানে গানের সঙ্গে আধ্যাত্মিক গল্প, উপদেশ বা জীবনদর্শন যুক্ত থাকে। পরিবেশনার সময় এক বা একাধিক প্রধান গায়ক থাকেন, যাঁরা গানের মূল অংশ পরিবেশন করেন, এবং অন্যান্য সদস্যরা সঙ্গত বা কোরাসে অংশগ্রহণ করেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে একতারা, দোতারা, ঢোল, খঞ্জনি, মঞ্জিরা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়, যা গানের সুর ও ছন্দকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অনেক সময় পরিবেশনার সঙ্গে দেহভঙ্গি বা হালকা নৃত্যও যুক্ত হয়, যা গানের আবেগকে আরও গভীরভাবে প্রকাশ করে। ফকিরি গীতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রতীকী ও রূপকধর্মী ভাষা। এই গানে আধ্যাত্মিক ভাবনা ও জীবনদর্শন প্রকাশের জন্য বিভিন্ন প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার করা হয়। যেমন—“পথ” জীবনের যাত্রাকে নির্দেশ করে, “সাগর” ঈশ্বর বা পরম সত্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এবং “মনের মানুষ” আত্মার গভীরতর চেতনা বা ঈশ্বরসত্তাকে বোঝায়। এই ধরনের প্রতীকী ভাষা গানের অর্থকে বহুমাত্রিক করে তোলে এবং শ্রোতাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়।[২১] এর ফলে ফকিরি গীত কেবল একটি শ্রুতিমধুর অভিজ্ঞতা নয়, বরং একটি গভীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক অনুধাবনের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বার্তা

ঝাড়খণ্ডের ফকিরি গীতের অন্যতম প্রধান সামাজিক ভূমিকা হলো বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ঐক্য, শক্তি, সহমর্মিতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গানে আল্লাহ, ঈশ্বর, হরি বা রাম—সবকেই এক সর্বজনীন সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা ধর্মীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতাবাদের বার্তা দেয়। গ্রামীণ পরিবেশে যখন এই গান পরিবেশিত হয়, তখন হিন্দু-মুসলিমসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হয়ে তা উপভোগ করে এবং অংশগ্রহণ করে। এই সম্মিলিত অংশগ্রহণ পারস্পরিক বিশ্বাস, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধকে শক্তিশালী করে। ফলে ফকিরি গীত সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক জীবন্ত প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২২] ঝাড়খণ্ডের গ্রামীণ সমাজে ফকিরি গীত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এটি একদিকে যেমন শ্রমের ক্লান্তি দূর করতে সহায়তা করে, অন্যদিকে মানসিক প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক তৃপ্তি প্রদান করে। সন্ধ্যাকালীন আসর, আখড়া কিংবা অবসর সময়ে এই গীত পরিবেশিত হয়, যা গ্রামীণ মানুষের বিনোদন ও সামাজিক মেলবন্ধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এছাড়া, এই গানের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা, জীবনদর্শন এবং মানবিক মূল্যবোধ সহজভাবে প্রচারিত হয়, যা গ্রামীণ সমাজের নৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করে।[২৩] ফকিরি গীত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মেলা ও উৎসবে বিশেষভাবে

পরিবেশিত হয়। সুফি দরগাহ, ওরস উৎসব, গ্রামীণ পূজা-পার্বণ কিংবা স্থানীয় মেলায় এই গানের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই ধরনের অনুষ্ঠানে ফকিরি গীত একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যেখানে মানুষ ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত হয় এবং একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি কেবল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর সামাজিক মিলনমেলায় পরিণত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ফকিরি গীত ধর্মীয় সহনশীলতা ও আন্তঃসম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক শক্তিশালী বাহক হিসেবে কাজ করে।[২৪]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিফলন

প্রাচীনকাল থেকেই লোকজ সংস্কৃতির সাধক ও শিল্পীরা তাঁদের রচিত গানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ঐক্য, মানবতা এবং সহনশীলতা, ও সমন্বয়ের বার্তা প্রচার করে আসছেন। যখন সমাজে জাতপাতের বিভাজন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখনও তাঁদের কলম থেমে থাকেনি। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কঠোর নিয়ম ও সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যেও তাঁরা নির্ভয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলেছেন এবং ভেদাভেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁরা নিজেদের সৃষ্ট গান গেয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনভাবে এই বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। কেবল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথাই নয়, সমাজে প্রচলিত বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধেও তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ফলে ধর্মীয় পরিচয়ের ভেদাভেদ এখানে গুরুত্ব হারায় এবং সাধারণ মানুষ আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। গ্রামীণ সমাজে ফকিরি গীতের আসরে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে অংশগ্রহণ করে, যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতাকে আরও দৃঢ় করে। তাই এই গীতধারা সামাজিক বিভাজন দূর করে ঐক্যের সেতুবন্ধন গড়ে তোলে। ফকিরি গীতের অন্তর্নিহিত দর্শন মূলত মানবতাবাদী। এখানে মানুষকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবিক মূল্যবোধকে স্থান দেওয়া হয়। এই গানে প্রায়ই বলা হয় যে, সত্যিকার ধর্ম হলো মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি। ফলে ফকিরি গীত মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর মানবসমাজের অংশ হিসেবে নিজেকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য এবং পারস্পরিক সহাবস্থানকে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে লালন ফকির-এর একটি গান এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। [২৫]

একবার জগন্নাথে দেখে যেয়ে।
কেমনে রাখবি বাঁচিয়ে (এ জাত),
চণ্ডালে রাঁধিছে অন্ন
ব্রাহ্মণে তা লয় খেয়ে। [২৫, পৃ.১১১]

জাত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুঁসনা বলিয়ে (রে মন),
লালন কয় জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে (এ জাত)। [২৫, পৃ.১১২]

জাত গেল জাত গেল ব'লে একি আজব কারখানা।
সত্য পথে কেউ নয় রাজি, সব দেখি তানা-নানা!
যখন তুমি ভবে এলে
তখন তুমি কি জাত ছিলে

কি জাত হবা যাবার কালে
সেই কথা কেনো বল না!
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ,চামার, মুচি
এক জলে সকলে শুচি
দেখে শুনে হয় না রুচি
যমে তো কাকেও থোবে ॥
গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়
তাতে ধর্মের কি ক্ষতি হয়
লালন বলে জাত কারে কয়
এই ভ্রম তো গেলো না। [২৬, পৃ.১৮৮]

ফকিরি চাঁদ লিখিছেনে -
কাঙাল বলছি সকলেই সমান
ও তা মুখে বোলে কাজে না দেখান
বিনে তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান ভেদজ্ঞান
কভু না যায়। [২৭,পৃ. ১১৩]
পাশাপাশি দ্বিজ দাস লিখিছেনে -

ভক্ত মুসলমানে পড়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ
ত্রি-সন্ধ্যা নিয়ম মানা হিন্দুজনের কাজ।
(ওরে) সপ্তাহ পরে রে, যে জন যায় গির্জাতে,
তারাই তো জগতের মানুষ প্রধান।।
শুনো দ্বীজদাসের গান [২৮,পৃ. ১১৪]
বিজয় সরকার লিখিছেনে -
হিন্দুর এই হিংসা বিদ্বেষে, ছুতস্পর্শ বিষম বিষে,
জাতির জীবন বাঁচবে কিসে, বসে বসে ভাবি তাই,
ঠুনকো জাতি চরাচরে, আজ না হয় কাল ভাঙবে পরে,
পাগল বিজয় বলে বিষাদ ভরে, জাতভেদের মুখে ছাই। [২৯ পৃ. ১১৫]

ফকিরি গীত ধর্মীয় সহনশীলতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এই গানে কোনো একক ধর্মের প্রাধান্য নেই; বরং বিভিন্ন ধর্মের উপাদান ও প্রতীক একত্রে মিশে একটি সমন্বিত আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ ভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখে এবং পারস্পরিক সহনশীলতা গড়ে ওঠে। বর্তমান সমাজে যেখানে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বিভাজন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে ফকিরি গীতের এই সহনশীলতার বার্তা বিশেষভাবে তা□পর্যপূর্ণ। এটি মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে, ভিন্নতা সত্ত্বেও সকলের মূল লক্ষ্য এক-মানবকল্যাণ আধ্যাত্মিক উন্নতি। ভাগাভাগি কবিতায় কবি অনির্বান দত্ত মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ উঠে এসেছে-
(১) কোন্ ফলটা মুসলিমে খায়, কোন্ ফল খায় হিন্দুতে?

তষে্টো পলেে তফাত খ◌োঁজে◌া-পানি বা জলবনি্দুত?
পটেরে জ্বালা সমান সবার, সমান-শীতে কাতরান◌ো,
হঠা□ আল◌ো নভিলে সমান-সবার আঁধার হাতড়ান◌ো। [৩০,পৃ. ৯৮]

(২) পাশাপাশি ঘুম◌োই তবু ফারাক রাখি যখন জগে,
ছ◌োঁয়া বাঁচাই পাতইে শুধু, একই অন্ন ভকি্ষা মগে!
একই পথে কারখানা যাই, ঘুরি চাকায় একই সাথ,
একই চাষে ধরি লাঙল, তবুও আল দুটি মাঠ। [৩০,পৃ. ৯৮]

ক্ষত্রেসমীক্ষা

এই গবষেণার ক্ষত্রেসমীক্ষা ঝাড়খণ্ডরে ব◌োকার◌ো জলোর চন্দন কয়িারি অঞ্চলরে কয়কেটি গ্রাম এখনও সীমতি পরসিরে ফকরি গীতরে চর্চা বদি্যমান। বশিষেত আদারকুড়ি, জালাবাঁধ ও আশপোশরে গ্রামগুলতি প্রবীণ শলি্পী ও গ্রামীণ মানুষদরে মধ্য এই গানরে ঐতহি্য লক্ষ্য করা যায়। অঞ্চলটি নর্বিাচনরে মূল কারণ হল◌ো এখান বভিনি্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়রে মানুষ বসবাস করনে। ৫০—৭০ বছর বয়সী কয়কেজন ল◌োকশলি্পীর সঙ্গে সাক্ষা□কার নওেয়া হয়ছে, তাঁদরে মধ্য উল্লখেয◌োগ্য হলনে—শ্রী গণশে ফকরি (৬৫), শ্রী হরগ◌ৌরী চত্রিকার (৬৮) এবং শ্রী রহমি আনসারি (৬০)। শলি্পীদরে মত, অতীত ফকরি গীত ছলি গ্রামীণ জীবনরে একটি অবচ্ছিদে্য অংশ। মলো, ওরস, পূজা-পার্বণ বা সন্ধ্যাকালীন আসর এই গান পরবিশেতি হত◌ো এবং গ্রামবাসীরা সকল মলিতি হয় এত অংশগ্রহণ করত। কনি্তু বর্তমান এই চর্চা অনকেটাই কম গছে। তরুণ প্রজন্মরে মধ্য আগ্রহরে অভাব, আর্থকি অনশি্চয়তা এবং আধুনকি বন◌োদনরে প্রভাব এই গীতধারাক দুর্বল কর তুলছ। এক প্রবীণ শলি্পী উল্লখে করনে—"আগ আমরা মাঠ কাজ করত করত, বা রাত আখড়ায় বস এই গান গাইতাম। এখন সইে পরবিশে আর নইে, ছলেপেুলরো ম◌োবাইল নয়ি ব্যস্ত।"শলি্পীদরে মত, অতীত ফকরি গীত ছলি গ্রামীণ জীবনরে একটি অবচ্ছিদে্য অংশ। মলো, ওরস, পূজা-পার্বণ বা সন্ধ্যাকালীন আসর এই গান পরবিশেতি হত◌ো এবং গ্রামবাসীরা সকল মলিতি হয় এত অংশগ্রহণ করত। কনি্তু বর্তমান এই চর্চা প্রায় বলিুপ্তরি পথ । তরুণ প্রজন্মরে মধ্য আগ্রহরে অভাব, আর্থকি অনশি্চয়তা এবং আধুনকি বন◌োদনরে প্রভাব এই গীতধারাক দুর্বল কর তুলছ।[৩১] সংগৃহীত কয়কেটি ফকরি গীতরে অংশ নচি উপস্থাপন করা হল◌ো—

(১) 'গুরুবার যে জন খায় ম□স্য পড়া।
সাত জন্ম গরু মা গ◌ো পরজন্ম ঘঁড়া ।।

(২) সন্ধ্যাকাল সাঁজবাতি, সকালবলোয় ছড়া।
যে জন দয়ে মা গ◌ো, সে হয় না লক্ষ্মীছাড়া।।

(৩) যার ঘর জ্বল মা গ◌ো সন্ধ্যাকাল বাতি।
তার ঘর বসতি মা গ◌ো লক্ষ্মী-ভগবতী।।

(৪) পাড়া-পড়শীর সঙ্গে যে জন বপিদ-আপদ।
জীবন কাট তার ফুর্তি-আম◌োদ

(৫) 'মাছ ধুয়ে আঁশ্টানি জল যে গেহালে ফেলোয়।
রকত বসন্ত রেোগে সে জন কষ্ট পায়।।

(৬) আমাবইসা-পুন্নিমা দিনে যে মাছ-মাংস খায়।
তার ঘর ছেড়ে লেক্ষ্মী পালিয়ে যে যায়। [৩২]

বিলুপ্তির কারণ

ঝাড়খণ্ডের ফকিরি গীত বর্তমানে এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত নানা পরিবর্তনের ফলে এই ঐতিহ্যবাহী গীতধারা ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। বিশ্বায়ন ও আধুনিকতার প্রসারের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। পূর্বে গ্রামীণ সমাজে যে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক পরিবেশে ফকিরি গীতের চর্চা হতো, তা এখন অনেকটাই বিলুপ্ত। যান্ত্রিকীকরণ, নগরায়ন এবং পেশাগত পরিবর্তনের ফলে মানুষের অবসর সময় ও সামাজিক মিলনক্ষেত্র কমে গেছে। ফলে এই ধরনের লোকজ গানের স্বাভাবিক পরিবেশ আর আগের মতো নেই, যা এর ধারাবাহিকতাকে ব্যাহত করছে। ৩৩ ফকিরি গীতের শিল্পীরা অধিকাংশই আর্থিকভাবে অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছেন। এই গীত পরিবেশনের মাধ্যমে স্থায়ী আয়ের কোনো নির্ভরযোগ্য উ□স নেই, ফলে অনেকে শিল্পী বাধ্য হয়ে অন্য পেশায় যুক্ত হচ্ছেন। সরকারি বা বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। ফলস্বরূপ, এই শিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার আগ্রহ নতুন প্রজন্মের মধ্যে তৈরি হচ্ছে না। বর্তমান সময়ে রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটভিত্তিক বিনোদনের প্রসার লোকজ সংস্কৃতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। [৩৪]

সংরক্ষণ ও পুনর্জাগরণের উপায়

ফকিরি গীত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে লোকশিল্পীদের জন্য আর্থিক সহায়তা, ভাতা, এবং বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য পৃথক তহবিল গঠন, শিল্পীদের নথিভুক্তকরণ এবং তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া, সাংস্কৃতিক দপ্তরের মাধ্যমে নিয়মিত লোকসঙ্গীত উ□সব, মেলা এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন এবং এই গীতধারা নতুন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবে।[৩৫] বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর যুগে ডিজিটাল সংরক্ষণ অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি। ফকিরি গীতের অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং, লিরিক্স সংগ্রহ, এবং শিল্পীদের সাক্ষা□কার সংরক্ষণ করে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি করা যেতে পারে। এই আর্কাইভ গবেষক, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকলে এই ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। ইউটিউব,সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইত্যাদি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এই গীতধারাকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা সম্ভব। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে, সাংস্কৃতিক কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই গীতধারার সঙ্গে পরিচিত করা যেতে পারে।[৩৬]

আলোচনা

ফকিরি গীত গ্রামীণ সমাজে সামাজিক সংহতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গীতের মাধ্যমে মানুষ ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত হয় এবং একটি অভিন্ন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অংশীদার হয়। বিশেষত হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে গীতধারা কার্যকর ভূমিকা রাখে।[৩৭] তবে একই

সঙ্গে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, আধুনিকতার প্রভাব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং প্রজন্মান্তরের বিচ্ছিন্নতার কারণে এই গীতধারা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। ফলে এর সামাজিক প্রভাবও আগের তুলনায় সীমিত হয়ে আসছে।[৩৮] Clifford Geertz-এর প্রতীকী নৃতত্ত্ব অনুযায়ী, সংস্কৃতি একটি প্রতীকী ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে মানুষ অর্থ ও মূল্যবোধ প্রকাশ করে। ফকিরি গীতের প্রতীক ও রূপকের মাধ্যমে যে মানবতাবাদী ও সম্প্রীতির বার্তা প্রকাশ পায়, তা এই তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৩৯] বলা যায় যে ফকিরি গীত একটি কার্যকর সামাজিক ও প্রতীকী কাঠামো হিসেবে কাজ করে। সার্বিকভাবে বলা যায়, আলোচনায় ফকিরি গীতের বহুমাত্রিক গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। একদিকে যেমন সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতির বাহক, অন্যদিকে তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যা সংরক্ষণ ও পুনর্জাগরণের দাবি রাখে।[৪০]

উপসংহার

এই গবেষণায় ঝাড়খণ্ডের ফকিরি গীতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা, এবং বর্তমান সংকটসমূহ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, ফকিরি গীত শুধুমাত্র একটি লোকসংগীতধারা নয়; বরং বহুসাংস্কৃতিক সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবতাবাদ এবং আধ্যাত্মিক চেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ বাহক। সুফি ও ভক্তি ভাবধারার সম্মিলনে গড়ে ওঠা এই গীতধারা মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদ দূর করে এক সার্বজনীন ঐক্যের বার্তা প্রদান করে। গ্রামীণ সমাজে এর প্রভাব একসময় অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, যা সামাজিক সংহতি ও পারস্পরিক সহমর্মিতা গড়ে তুলতে সহায়তা করত।তবে বর্তমান সময়ে আধুনিকতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, প্রজন্মান্তরের বিচ্ছিন্নতা এবং মিডিয়ার প্রভাবের কারণে ফকিরি গীত বিলুপ্তির মুখে পড়েছে। এর ফলে এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হচ্ছে এবং সমাজে এর প্রভাব ক্রমশ কমে আসছে। যদি এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে, তবে ভবিষ্যতে ফকিরি গীত সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে এই ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, ডিজিটাল সংরক্ষণ, শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসারের মাধ্যমে এই গীতধারাকে নতুন করে প্রাণবন্ত করা যেতে পারে। নতুন প্রজন্মকে এই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে ফকিরি গীত ভবিষ্যতেও তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে।সবশেষে বলা যায়, বর্তমান সমাজে যখন ধর্মীয় বিভাজন ও অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন ফকিরি গীতের মতো ঐতিহ্য আমাদের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। আমাদের শেখায় যে, ভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষ একত্রে বসবাস করতে পারে এবং মানবতাই সকল ধর্মের মূল ভিত্তি। তাই ফকিরি গীত শুধু একটি সাংস্কৃতিক সম্পদ নয়, বরং একটি সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা, যা আমাদের সমাজে শান্তি, সহনশীলতা এবং সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাই এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা কেবল সাংস্কৃতিক দায়িত্ব নয়, বরং একটি মানবিক কর্তব্যও বটে।[৪১]

তথ্যসূত্র

1. মুখোপাধ্যায়, সুনীতি, সাহিত্য সঞ্চয়ন - চতুর্থ ভাগ পৃ. ৯৮
2. মাহাতো চন্দ্র বঙ্কিম, ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, ১৯৭৮, অবনীন্দ্রনাথ বেরা বানী শিল্প ১৪ এ টেমার লেন কলকাতা পৃ. ৪০
3. পূর্বোক্ত পৃ. ৩৪
4. হংসেশ্বর মাহাতো, সুভাষ রায়, ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো, কিরীটি মাহাতো, শিব শঙ্কর সিং মানভূমের লুপ্তপ্রায় লোকগীত, মানভূম কালচারাল আকাডেমিক তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ.

৩৪
5. ড. আবদুল ওয়াহাব,বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত ১৯৯৯, রত্নাবলি ১১ এ ব্রজ নাথ মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ পৃ. ১৮০
6. ক্ষিম চন্দ্র মাহাতো ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য,1978, অবনীন্দ্র নাথ বেরা বানী শিল্প ১৪ এ টেমার লেন কলকাতা
7. পূর্বোক্ত পৃ. ৪১
8. Ramanujan, A. K. (1999). Folktales from India: A Selection of Oral Tales from Twenty-two Languages. New Delhi: Penguin. Page: 23
9. Tagore, R. (1917). Nationalism. London: Macmillan. Page: 102
10. Malinowski, B. (1944). A Scientific Theory of Culture. Chapel Hill: University of North Carolina Press. Page: 41
11. Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books. Page: 5
12. Sen, G. (1998). Crossing Boundaries: Sufi Music and Culture. New Delhi: Orient Blackswan. Page: 60
13. Sharma, R. (2015). Sufi Traditions in India: History and Culture. New Delhi: Oxford University Press. Page: 135
14. সেন, সুকুমার। (২০০৫), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ২৩
15. ভট্টাচার্য, অশুতোষ (২০০১) বাংলার লোকসংস্কৃতি। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৪১
16. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (২০০২) ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ১০২
17. চণ্ডীদাস চণ্ডীদাসের পদাবলী। পৃ. ৪৫
18. ভট্টাচার্য, অশুতোষ। (২০০১) বাংলার লোকসংস্কৃতি। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৬৫, ৭২
19. সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০০) বৃহৎ বঙ্গ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৮৮
20. সেন, সুকুমার। (২০০৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ৫৬
21. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (২০০২) ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। পৃ. ১২০
22. ভট্টাচার্য, অশুতোষ। (২০০১) বাংলার লোকসংস্কৃতি। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৬৮
23. সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০০) বৃহৎ বঙ্গ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।পৃ. ৯২
24. সেন, সুকুমার। (২০০৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ৭৫
25. ড. তপন রায় ও ড . রীতা সাহা লোক সংগীতের সহজ পাঠ 2025 , লালমাটি প্রকাশন 3 শ্যামা চরণ দে স্ট্রিট কলকাতা পৃ.১১১, ১১২
26. ড. আবদুল ওয়াহাব,বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত ১৯৯৯, রত্নাবলি ১১ এ ব্রজ নাথ মিত্র লেন, কলকাতা, পৃ. ১৮৮
27. ড. তপন রায় ও ড . রীতা সাহা লোক সংগীতের সহজ পাঠ ২০২৫, লালমাটি প্রকাশন ৩ শ্যামা চরণ দে স্ট্রিট কলকাতা, পৃ. ১১৩
28. পূর্বোক্ত পৃ. ১১৪
29. পূর্বোক্ত পৃ. ১১৫
30. সুনীতি মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সঞ্চয়ন - চতুর্থ ভাগ পৃ. ৯৮
31. সাক্ষাৎকার, গণেশ ফকির, হারাগৌরি চিত্রকর, রহিম আনসারী চন্দন কিয়ারি অঞ্চল, গ্রাম - আদার কুড়ি, জালা বাঁধ, জেলা-বোকারো(ঝাড়খণ্ড)

32. হংসেশ্বর মাহাতো, সুভাষ রায়, ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো, কিরীটি মাহাতো, শিব শঙ্কর সিং মানভূমের লুপ্তপ্রায় লোকগীত, মানভূম কালচারাল আকাডেমিক তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ ৩৮
33. ট্টাচার্য, অশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি (২০০১), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পৃ.৯৫
34. সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ (২০০০), কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১০৫
35. ট্টাচার্য, অশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি (২০০১), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পৃ.১২০
36. সেন, সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২০০৫), কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১৩২
37. ভট্টাচার্য, অশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি (২০০১), কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং পৃ. ১৪৫
38. সেন, সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২০০৫), কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১৫৮
39. Geertz, C. The Interpretation of Cultures, (1973 New York: Basic Books. p. 5
40. সেন, দীনেশচন্দ্র। (২০০০), বৃহৎ বঙ্গ (২০০০), কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ১৬৮
41. হংসেশ্বর মাহাতো, সুভাষ রায়, ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো, কিরীটি মাহাতো, শিব শঙ্কর সিং মানভূমের লুপ্তপ্রায় লোকগীত, মানভূম কালচারাল আকাডেমিক তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ ৩৯-৪০